OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 293 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 293 - 298
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ সান্যালের দেশভাগকেন্দ্রিক উপন্যাস ‘বল্মীক’ : শিশু-কিশোর চরিত্র

সোহম হোসেন
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : somu05soham@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Narayan Sanyal, Balmik, Partition, Children, Refugee, Bengali Novel, Refugee Camp, Independence.

Abstract
Partition is an important chapter in the history of India. The year 1947 brings to mind India's independence and also the partition of the country. The partition had a direct impact on Bengali literature. Several novels have been written in Bengali literature about the partition of the country. Among those, Balmik, written by Narayan Sanyal, is important. This novel is about refugee life. The life struggles, hardships and despair of uprooted refugees are the subject of this novel. This novel shows the reality of chaotic independent India. This novel also shows the suffering of children and teenagers who got emigrated. The nature of those children is highlighted in this article.

Discussion

১৯৪৭-এর দেশভাগ গৃহচ্যুত করেছিল অগণিত মানুষদের। গৃহচ্যুত মানুষরা বাধ্য হয়েছিল দেশান্তরিত হতে। ধর্মের সীমারেখা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দেশ ও বাসভূমিকে পৃথক করে দিয়েছিল। প্রাণভয়ে, নতুন বাসভূমির খোঁজে রাতের অন্ধকারে মানুষ স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি দেয়, হয় উৎসচ্যুত।

১৯৪৬-এর নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসতে শুরু করে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ এদেশে চলে আসে। এই হল উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম পর্যায়। উদ্বাস্তু আগমনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এসময় পাকিস্তানে নিরস্ত্র হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর চলে মারাত্মক অত্যাচার, যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। ফলস্বরূপ বহুসংখ্যক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করে। ১৯৫১-তে এদেশে উদ্বাস্তু সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ লক্ষ। ১৯৬০-৬৫ সালে, উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায়ে আরও ১০ লক্ষের মতো মানুষ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে চলে আসে। আবার ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে প্রায় ৭ লক্ষ মুসলমান জনতা ওদেশে চলে যায়। এসকল উৎসচ্যুত মানুষের প্রত্যেকে নতুন দেশে এসেই স্থায়ী বাসস্থান পায়নি। উৎসচ্যুত শরণার্থীদের প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের শরণার্থীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলক ভাবে স্বচ্ছল। তারা নিজেদের উদ্যোগে এবং নিজেদের সামর্থ্যের উপর ভর করে নতুন বাসস্থান খুঁজে নিয়েছে। দ্বিতীয়

ভাগের শরণার্থীরা আর্থিক ভাবে আগের পর্যায়ের মানুষদের মতো স্বচ্ছল নয়। তবে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই সন্ধানের উদ্যম ছিল অনেক। এরা বাড়ি বিনিময় করে, ফাঁকা জমি বা বাড়ি দখল করে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রাম-শহরের আনাচে-কানাচে নিজ বাসস্থান গঠন ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। তৃতীয় ভাগের শরণার্থীদের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। হত দরিদ্র অসহায় এই মানুষগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ক্যাম্প, কলোনি প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নেয়।

নারায়ণ সান্যাল ১৯৫৪ সালে ‘বল্মীক’ উপন্যাসটি রচনা করেন এবং ১৯৫৫ সালে তা প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা ও দেশভাগের নয়-দশ বছর পরে রচিত ‘বল্মীক’ উপন্যাস লেখকের নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার এক ঔপন্যাসিক রূপায়ন। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় লেখক কাটিয়েছেন পূর্ব-বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের সঙ্গে। কর্মসূত্রে তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন ট্রানজিট ক্যাম্প, পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি ক্যাম্প, উদ্বাস্তু কলোনি ও দন্ডকারণ্যের মানুষের জীবন সংগ্রাম। সেরকমই একটি উদ্বাস্তু কলোনির কথা উঠে এসেছে ‘বল্মীক’ উপন্যাসে। উপন্যাসের কাহিনিমূলে থেকেছে মতিগঞ্জের হরিপদ মাস্টারের পরিবার। পূর্ব-বাংলা ছেড়ে নতুন দেশে আসা, ছিন্নমূল হয়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় খোঁজা, উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনিতে আশ্রয় পাওয়া, কষ্টকর জীবন যাপন, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, হার না-মানা মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা, শিশু-কিশোর চরিত্রের গঠন ইত্যাদি ঘটনা হয়েছে উপন্যাসটির মূল উপজীব্য।

দেশভাগ মানুষের জীবনে যে এক চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল এই উপন্যাস সেই বাস্তবতার কথাই বলে। দেশভাগ প্রত্যেক বয়সের মানুষের জীবনে ভিন্ন পথে প্রভাব বিস্তার করেছিল। শৈশব-কৈশোরকে অতিক্রম করে মানুষ পা বাড়ায় তার আগামী জীবনের দিকে। জীবনের অন্যতম সংবেদনশীল সময় হল শৈশব-কৈশোর। খুদে চোখে দেখা পৃথিবী থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে মানুষের সারা জীবনের সম্বল। যেসকল শিশু-কিশোর স্বচক্ষে দেশভাগ দেখেছে এবং দেশান্তরী হয়েছে, তাদের আজীবন বয়ে নিয়ে চলতে হয় এক দুর্বিষহ বেদনা। সারাজীবন এক ক্ষতযুক্ত শৈশব-কৈশোকে বহন করে নিয়ে যাওয়া শুধু উপন্যাসের চরিত্রের ক্ষেত্রেই সত্য নয় — তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। এই সত্যকে সমর্থন করে অমিতাভ দেব চৌধুরী তাঁর ‘নষ্টনীড় : দেশভাগ এবং বাঙালি’ প্রবন্ধে লিখেছেন —

> “যে কোনো কাঠের আসবাবের গভীরে একটি করাতের দংশনচিহ্ন লুকিয়ে থাকে। ঐ করাত একদা ঐ কাঠটিকে তার বৃক্ষজীবনের অধিকারচ্যুত করেছিল। আমরা যখন কাঠের আসবাব দিয়ে ঘর সাজাই, আমরা ভুলে যাই সেই করাতের কথা। ভুলে যাই বৃক্ষ কীভাবে ক্ষতকে লুকিয়ে কাঠে রূপান্তরিত হয়েছে।”[১]

‘বল্মীক’ উপন্যাসে বেশ কয়েকটি শিশু চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হল — হরিপদ মাস্টারের ছোট ছেলে বাবলু (উপন্যাসের শুরু তে বয়স এগারো বছর), হরিপদ মাস্টারের ছোট মেয়ে লতু(উপন্যাসের শুরুতে বয়স পনেরো বছর) এবং হরিপদ মাস্টারের বড় ছেলের পুত্রসন্তান গোরা (উপন্যাসের শুরুতে বয়স দুই-তিন বছর)। প্রত্যেকটি শিশুচরিত্রই দেশভাগের প্রভাবে প্রভাবিত, তবে স্বতন্ত্র ধারায়। পূর্ব-বাংলার উমাশশী স্কুলের সম্মাননীয় প্রধান শিক্ষক হরিপদ চক্রবর্তীর পরিবার ওপার বাংলায় সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন ছেড়ে বাধ্য হয় দেশান্তরী হতে। নিজের দেশ ছেড়ে আসার সময় থেকেই শিশু-কিশোরসহ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রেরা মুখোমুখি হয় সংশয় ও দ্বিধার। সংশয়ের মূলে ছিল দেশভাগের কারণ। পূর্ব-বাংলার মতিগঞ্জের হিন্দু পরিবারটির সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের কোনও বিবাদ তো ছিলই না, বরং তাদের মধ্যে ছিল নির্ভরশীলতায় ভরপুর সুসম্পর্ক। মুসলমান চরিত্র জোবেদালির সঙ্গে হরিপদ মাস্টারের কথোপকথনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়—

> “ধরা গলায় জোবেদালি বলে : আমাগো কি অইব? দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়া দাঁড়াইবাম? হরিপদ চক্রবর্তীর মনে হল জোবেদালির সঙ্গে তার আত্মার আত্মীয়তা আছে। সুখ দুঃখের নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দীর নির্দেশে! র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। দুঃখের রাতে জোবেদালির কোনও নিরাপত্তা নেই চক্রবর্তী বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়া। চক্রবর্তী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 293 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> বাড়ির কোনও উৎসবও সম্পন্ন হতে পারে না পরিবার-ভুক্ত জোবেদালির উপস্থিতি ভিন্ন। হরিপদ চক্রবর্তী বলেন : মনখারাপ করিস না আলি। তুই আমার পরিবারের লোক— আমার আত্মীয়। তোকেও আমি নিয়ে যাব কলকাতায়।”[২]

অথচ হাজার-হাজার মুসলমান পরিবারের মতো জোবেদালিও থেকে যায় পূর্ব-বাংলায়। কলকাতায় আসা হয় না তার। এরকম সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান মানুষরা বুঝতে পারে না ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কারণ। মনে দ্বিধা-সংশয় ও আগামীর অনিশ্চয়তা নিয়ে চলে আসে নতুন দেশে। উপন্যাসের শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোর জীবন সংগ্রামের সূচনা হয় এই পর্যায় থেকেই।

দেশান্তরী হওয়ার পর থেকেই হরিপদ মাস্টারের পরিবারের কাঠামো পরিবর্তিত হতে শুরু করে। পরিবর্তন হয় আর্থিক, সামাজিক এবং বিদ্যার্জনের প্রেক্ষিতে। নতুন দেশে আসার পর সাত-আট বছর সময় অতিক্রান্ত। উপন্যাসে বর্ণিত উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনির ঘরবাড়িগুলোর অবস্থা নড়বড়ে। কলোনিতে একটি অসমাপ্ত ঘরের মাথায় করগেট চাপিয়ে কোনও মতে বসবাস করে চক্রবর্তী পরিবার। পরিবারের সদস্য সংখ্যা আট জন। ঘরের মাঝখানে একটি শাড়ি টাঙিয়ে দেওয়াল তৈরি করা। একদিকে হরিপদ,তার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী এবং দুই মেয়ে নমিতা ও লতু থাকে আর অন্যদিকে থাকে সস্ত্রীক অনিমেষ থাকে তাদের পুত্র গোরাকে নিয়ে। শিশু চরিত্র বাবলুর থাকার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। এই পরিবেশে প্রত্যেকটি মানুষের সাধারণ জীবনযাপন অসম্ভব। পারিবারিক উন্নতির একমাত্র উপায় অর্থ উপার্জন। তবে সে পথে বাধ সাধে সমূহ প্রতিকূলতা। অনিমেষ, নমিতা, বাবলু — প্রত্যেকেই পূর্ব-বাংলায় থাকাকালীন মেধাবী ছাত্রছাত্রী ছিল। কিন্তু নতুন দেশে এসে তাদের পড়াশুনোর পথটাই বন্ধ হয়ে যায়। ওকালতির ছাত্র হতে চাওয়া অনিমেষ হয় রিক্‌শাচালক, এদেশে এসে নমিতার বি.এ, এম.এ পড়া হয়ে ওঠে না। বাকি থাকে বাবলু। কিশোর বাবলু পড়াশুনোর সুযোগ পেয়েও পড়াশুনো থেকে বঞ্চিত। আট জনের পরিবারে একমাত্র উপার্জন করে সে, তাও লুকিয়ে। অনিমেষ অসুস্থতার কারণে দুই মাস শয্যাশায়ী। এগারো বছরের কিশোর বাবলু সংসার চালানোর জন্য নিজের পড়াশুনো বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বৌদি কামিনীর সঙ্গে মিলে ট্রেনে ‘সাড়ে চার ভাজা’ হকারি করে বাবলু। বাবলু বলে —

> “ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না বৌদি। লেখাপড়া শিখে মানুষও হতে কি আমার অসাধ? কিন্তু কি করবে বল? সংসারটা তো চালাতে হবে? এতগুলো লোককে তুমি কি খেতে দেবে যদি আমি ব্যবসাটা বন্ধ করে দেই?”[৩]

এক কিশোরের পরিবার সম্বন্ধে এরকম বোধ থাকা তাক লাগিয়ে দেয় পাঠকদের মনে। তবে এই তাক লাগানো দৃশ্য আসলে বহু শিশু-কিশোরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাবলু এবং বাবলুর মতো দেশভাগ-পীড়িত চরিত্রদের কাছে শৈশব-কৈশোর নির্মল না হয়ে হয়েছে নিষ্ঠুর। নারায়ণ সান্যাল বাবলু চরিত্রটিকে আত্মস্বার্থহীনতার এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। বাবলুর জীবন বোধের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় উপন্যাসের সুবিধাবাদী চরিত্র বিষ্টুপদ, যতীশরা। বিষ্টুপদদের মতো চরিত্রগুলো যখন অন্যের ভাগের অর্থ, খাদ্য এবং সুবিধা ভোগে ব্যস্ত, সেই সময়ে বাবলু স্বপ্ন দেখে একটা সুস্থ পরিবার গঠনের। বাবলুর সংগ্রামে তার সঙ্গে থেকে কামিনী। পিতা হরিপদ ও পরিবারের অন্যরা চায় পড়াশুনো করে বাবলু চাকরি পেয়ে সংসারের হাল ধরবে, কিন্তু বাবলু বোঝে সে পথে উপার্জন অনেক দেরিতে হবে। অথচ ততদিন পরিবার চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করার কেউ নেই। আবার তৈরি হয় দ্বিধা। সময় নষ্ট না করে বাবলু বিচক্ষণ চরিত্রের মতো বেছে নেয় রোজগারের রাস্তা। প্রথমে ভাবে বিষ্টুপদর চায়ের দোকানে পাঁচ টাকা মাইনে আর একবেলার খোরাকি নিয়ে কাজ করবে, কিন্তু হরিপদ মাস্টার রাজি হন না। তাই অনিমেষের স্ত্রী কামিনীর সাহায্যে বাড়ির সকলের চোখের আড়ালে বাবলু সারাদিন ট্রেনে হকারি করে। রাতে বাড়ি ফিরে কোনও দিন তার ভাগ্যে জোটে ভাতের ফ্যান, আবার কোনও দিন ফ্যানটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। পরিবারের একমাত্র চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় কিশোর বাবলু। কিন্তু কৈশোরের রীতি এমন হওয়ার কথা ছিল না। অনিমেষের ভাবনায় দেখা যায় বাবলুর শৈশব-কৈশোরের স্বরূপ —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 293 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কিন্তু বাবলুই কি এরকম ছিল চিরকাল? ছেলেবেলার বাবলুকে মনে পড়ে। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। নিটোল স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। ডাগর চোখ দুটির অন্তরালে যেন অতলস্পর্শী গভীরতা আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দুঃখ-কষ্টই পেয়েছে এতদিন। ওপারের জীবনটা তার কাছে গল্পকথা। নিজের বাল্যকালের সঙ্গে ভাইয়ের শৈশব তুলনা করে এতদিন শুধু কষ্টই পেয়েছে।"[৪]

—উদ্বাস্তু তকমা প্রাপ্ত কৈশোর হয়ে দাঁড়ায় কঠিন। কামিনী রাত জেগে চানাচুর ভাজে আর দিনে সেই সামগ্রী বিক্রি করে বাবলু। ট্রেনে হকারি করতে গিয়েও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয় সে। অল্পবয়সী হওয়ার কারণে অন্য হকার কর্তৃক সৃষ্ট নানা রকম প্রতিবন্ধকতার জবাব দিতে পারে না বাবলু। এই পরিস্থিতিতে পিছপা না হয়ে ধীরে ধীরে নিজের স্থান পাকা করে নেয়। কলোনির অন্যান্য পরিবারগুলো যখন সকরারি ডোলের আশায় দিনযাপন করে, তখন কিশোর বাবলু কঠোর সমাজের সঙ্গে মোকাবিলা করে খুঁজে নেয় উপার্জনের পন্থা। এরপরেও অর্থহীনতা দ্বিধাবিভক্ত করে তোলে পরিবারটিকে। বস্ত্রসংকট প্রকট হয়। যৌবনবতী কামিনীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয় বিষ্টুপদ মজুমদার। পরিবারের মধ্যে শুরু হয় বিভাজন। নির্দোষ-সৎচরিত্র কামিনীর প্রতি সন্দেহ করে আলাদা বাড়িতে চলে যায় হরিপদ, বিন্ধুবাসিনী, নমিতা ও লতু। বিচ্ছিন্ন হয় পারিবারিক যোগাযোগ। দুই পক্ষই ভাবে বাবলু অন্য পক্ষের সাথে থাকে। কিন্তু আসলে বাবলু হয় নিরুদ্দেশ। শিশু চরিত্রের এই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াও তার হার না মানা জীবনবোধেরই পরিচয় দেয়। উপন্যাসের শেষে এক অল্পবয়সী মৃত হকারের ট্রেনে কাটা পড়ার প্রসঙ্গে বাবলুর জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয় পরিবারের সবাই। বহুদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর এই ঘটনা যেন বাবলুর মৃত্যুকেই স্পষ্ট করে তোলে। হাসপাতালের মর্গে গিয়ে দেখা যায় যে বাবলু নয়, মারা গেছে বাবলুর সহকর্মী অন্য এক কিশোর। হরিপদর পরিবার জানতে পারে বাবলু হকারির কাজ ছেড়ে যোগ দিয়েছে কয়লা বাছার কাজে। এই কাজ আরও কষ্টকর। একজন পূর্ণবয়স্কের মতো পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে বাবলু। ঠিক করেছে পঞ্চাশ টাকা জমিয়ে ফিরে আসবে কলোনিতে, খুলবে নিজের দোকান এবং পুনরায় একত্রিত করবে নিজের পরিবারকে। উপন্যাসে দেখা যায় —

> "উদ্যোগী সিংহশাবক বাবলু। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' মন্ত্র তার। যে বয়সে ওর বাপ দাদারা অঙ্ক ইংরাজি শিখেছে— সে বয়সেই ওকে শিখতে হয়েছে উপার্জন। বিনা মূলধনের ব্যবসায় এবাজারে প্রায় অসম্ভব; কিন্তু অসম্ভবকে জয় করতেই ওর তারুণ্যের অভিযান। খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা ব্যবসা বার করেছে সে। জংশন স্টেশনে ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের রাবিশ থেকে বেছে বেছে আধপোড়া কয়লা উদ্ধার করে। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ থেকে কয়লার টুকরা খুঁজে বার করা আর হীরকখনিতে কয়লার স্তূপ থেকে হীরকখণ্ড বেছে বার করার মধ্যে কোনও তফাত নেই। অন্তত পরিশ্রমের দিক থেকে, ধৈর্যের মাপকাঠিতে, অধ্যাবসায়ের নিক্তিতে। তারপর ঝুড়ি করে বেচে দিয়ে আসে বাজারের দোকানে। বৌদি যদি চানাচুর নাই ভেজে দেয়— তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে? বাবা-মাকে মানুষ করার দায়িত্ব আছে না? দাদার অসুখ সারিয়ে তুলতে হবে না?"[৫]

আসলে ভেঙে যাওয়া পরিবারের মূল চালিকাশক্তি বাবলু। চরম বিশৃঙ্খলার উদ্বাস্তু জীবনে স্থির লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছে কিশোর চরিত্রটি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশান্তরী মানুষদের যেমন সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল বাস্তাবের মাটিতে তা সাধিত হয়নি কখনোই। এরকম স্বপ্নভঙ্গের পরিবেশে ছিন্নমূল কিশোর নিজের শিকড় শক্ত করার চেষ্টা করে চলেছে অনবরত। এই জীবনমুখী চেষ্টাই কিশোর চরিত্র বাবলুকে করে তোলে স্বতন্ত্র এবং দৃষ্টান্তমূলক।

'বল্মীক' উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লতু। লতুর বয়স পনেরো বছর। উপন্যাসের প্রথম দিকে লতু চরিত্রের মধ্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে শৈশবের প্রাণচাঞ্চল্য। এই পর্যায়ে কিশোরী লতুর মধ্যে লুক্কায়িত আছে শৈশবের নির্মল দস্যিপনা। উপন্যাসের প্রথমার্ধে লতুকে সংসারকর্মে অমনোযোগী এক চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। সে সকালবেলা বাড়ি থেকে বের হয় এবং সারাদিন আপন খেয়াল হই-হুল্লোড় করে দিন কাটায়। তবে উপন্যাস যত পরিণতির দিকে এগিয়েছে কিশোরী লতুর মনন-জগত ততটাই পরিবর্তিত হয়েছে। পরিপক্ব হয়েছে। উপন্যাসের দেখা যায়

কিশোরের সংকট ভিন্ন এবং কিশোরীর সংকট ভিন্ন। ধূর্ত বিষ্টুপদ কামিনীর প্রতি লোলুপ নজর দেয় অনিমেষের অসুস্থতা ও তাদের পরিবারের দারিদ্র্যের সুযোগে। অসুস্থ অনিমেষকে বাক্যবাণে অপমানিত করতে গিয়ে সে বাধা প্রাপ্ত হয় লতুর কাছ। বিষ্টুপদের কটূক্তির জবাবে লতু বলে –

> "কই কি যে চুনেও মুখ পোড়ে না– কালিতেও মুখ পোড়ে না এমন কি চুনকালি একসঙ্গে মুখে পড়লেও অনেক নির্লজ্জের মুখ কিছুতেই পুড়তে চায় না দাদু।"[৬]

স্পষ্টবাদী লতুর এই উক্তি সরাসরি চপেটাঘাত করে বিষ্টুপদকে। লতু সমাজ চিনেছে সাহিত্য পড়ে। তার উপন্যাস পড়ার স্বভাব এবং সে উপন্যাসের মতো একটা জগত বানিয়ে নিতে চায় নিজের চারপাশে। উদয়নগর উদ্বাস্তু কলোনির কিশোরী লতু উপন্যাস জুড়ে খুঁজেছে এক নিশ্চিন্ত জীবন – যা প্রত্যেক দেশত্যাগী মানুষের কাঙ্খিত বিষয়। যথেষ্ঠ সমাজবোধ সম্পন্ন লতু এই সত্য উপলব্ধি করেছে যে সুন্দর নিশ্চিন্ত আগামীর জন্য তার মতো কিশোরীর প্রয়োজন অবলম্বন। সেই অবলম্বনের পন্থা হিসাবে সে আবিষ্কার করেছে ভূষণকে। ফ্রক পরা, শিশুর মতো ছুটোছুটি করা লতু চরিত্রের পরিবর্তন হয় উপন্যাসে ভূষণ চরিত্রের আগমনের পরে। ভূষণ একজন ছোট ব্যবসায়ী এবং সমাজের কল্যাণে ব্রতী এক চরিত্র। কর্মসূত্রে তার সঙ্গে নমিতার আলাপ হয় এবং হরিপদ মাস্টারের বাড়ি ভূষণের যাতায়াত শুরু হয়। সকলের আড়ালে নমিতা এবং ভূষণের মনে প্রণয়-ভাব তৈরি হয়। কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাক্রম গতিলাভ করে যখন লতুও ধীরে ধীরে ভূষণের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। শিশুসুলভ ব্যবহার ছেড়ে লতু হয়ে ওঠে তরুণী। ভূষণের বোনের অনাথ সন্তান মিঠুর সঙ্গে গড়ে ওঠে লতুর সুমধুর সম্পর্ক। লতু মাতৃস্নেহে মিঠুকে আপন করে নেয়। ভূষণের বাড়ি গিয়ে তার বৃদ্ধা পিসিমাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। এসব কথা নমিতাসহ তা পরিবারের সকলের কাছে থাকে অজানা। লতু ভাবে –

> "লতু লক্ষ করেছে নমিতার ভাবান্তর। ও যে ভূষণবাবুদের বাড়ি গিয়ে আলাপ করে এসেছে এটা না জানানোতে দিদি অবশ্য রাগ করতেই পারে। দুই বোনের মধ্যে লুকোচুরির স্থান নেই। কিন্তু কি জানি কেন এ সত্যটা স্বীকার করতে লতু সঙ্কোচ বোধ করেছে প্রতিবারই।"[৭]

হরিপদ মাস্টারের পরিবার ও ভূষণের পরিবার ভুল বোঝাবুঝিতে নমিতা ভূষণ ও লতুর বিয়ের কথায় সায় দেয়। সেই ভুল ভাঙানোর আগেই উপন্যাসের শেষভাগে মৃত্যু হয় নমিতার। উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রামে হেরে যায় নমিতা। হেরে যায় ভূষণ। উপন্যাস শেষে লতুর হাতের মরকমুখী বালা ভুষণের হাতে ফোটার দৃশ্যের আড়ালে থেকে যায় কঠোর বাস্তব। নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার দোলাচলতায় লতু এগিয়ে চলে আগামীর দিকে।

বাবলু এবং লতু – দুই শিশু-কিশোর চরিত্র উপন্যাসে গতিলাভ করেছে ভিন্ন ধারায়। তাদের চলন স্বতন্ত্র হলেও উদ্দেশ্য একই। উদ্দেশ্য সুষ্ঠ জীবন গঠনের। বাবলু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের ভার গ্রহণের মাধ্যমে আগামীর পথে হেঁটেছে আর লতু কলোনি জীবনের দুর্দশা মুক্তির পথ খুঁজেছে ভূষণের সঙ্গে বিয়ে করে সুন্দর আগামী গঠনের মাধ্যমে। যাত্রাপথের সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে এই শিশু-কিশোরদের একনিষ্ঠ থাকতে হয় লক্ষ্যের প্রতি। হারিয়ে যায় তাদের আসল শৈশব-কৈশোর। পরিবর্তিত হয় দেশের সংজ্ঞা –

> "আমার শৈশব থেকেই দেশভাগ আর দেশভিখারি। সেদিন তেমন বুঝিনি নিশ্চয়। লাট্টু আর লেত্তির মজায় মগ্ন থেকেছি। ছোট্ট লাঠির টোকায় পিচের রাস্তা ধরে ঠনঠনিয়ে সাইকেলের রিংয়ের চলমানতায় মুগ্ধ হয়ে ছুটেছি। বুঝেছি পরে। যেমন বুঝেছি বাঙাল মনুষ্য নয়..."[৮]

–মধুময় পালের কথাগুলো যেন দেশভাগ পীড়িত সকল শিশু-কিশোরের বয়ান হয়ে ওঠে।

'বল্মীক' উপন্যাসে খুব কম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে আরেক শিশু চরিত্র, গোরা। অনিমেষ এবং কামিনীর সন্তান গোরার বয়স দুই-তিন বছরের বেশি নয়। গোরা স্বাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে। নতুন দেশের শিশু গোরা জীবনের শুরু থেকেই পরিচিত হয়েছে নিষ্ঠুর অরাজক সমাজের সঙ্গে। কোনও দেশের ভবিষ্যৎ হয় সেই দেশের শিশু-কিশোর। শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতার উপর ভর করে তারা গঠন করে দেশের পরিকাঠামো। সেইসূত্রে গোরার বেড়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 35
Website: https://tirj.org.in, Page No. 293 - 298
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওঠার পরিবেশটি খুব একটা সুগঠিত নয়। অস্বাস্থ্যকর ঘর, খাদ্যের অভাব, পরিবারের পরিবর্তিত কাঠামো, চরম দারিদ্র্য, ক্ষমতাবান মানুষের দুর্ব্যবহার — সব মিলে গোরা বেড়ে উঠতে শুরু করে এক হতাশাময় সমাজে। গোরা চরিত্র নির্দেশ করে ভারতের আগামী দিনের ভয়াবহ সংকটের দিকটিকে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ধূর্ত বিষ্টুপদ যখন কামিনীর বস্ত্র সংকটের সুযোগ নিয়ে তার দিকে কামনা-লোলুপ মনুষ্যতর প্রাণীর মতো এগিয়ে আসে, তখন ভয়ে, বিস্ময়ে কামিনীর স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন গোরার 'মা' বলে ডাকা যেন আটকে দেয় বিষ্টুপদকে। এখানে গোরা যেন হয়ে দাঁড়ায় সমাজের বিবেক। গোরা এবং গোরার মতো আরও অগণিত শিশুর সমানে অপেক্ষা করে অস্থির সেই সমাজ।

দেশভাগকেন্দ্রিক সকল বাংলা উপন্যাস জাতির নির্মাণকে নির্দেশ করে। সেই নির্মাণের মর্মমূলে থাকে ভাঙন এবং ভাঙন পেরিয়ে নতুন করে গঠন। স্বদেশ-ত্যাগী মানুষ ফেলে আসা জীবনের ক্ষত ভরিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে নতুন দেশ, নতুন সত্তা। তবে নবগঠিত দেশ বা সত্তা — দু'য়েই থেকে যায় প্রাচীন ক্ষতের চিহ্ন। এই ক্ষতচিহ্ন মনের ভেতর লালন করে মানুষ অস্তিত্ব সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বয়স-প্রাপ্তি ঘটে শিশু-কিশোরের। রাষ্ট্রনৈতিক সংকট অভিঘাত হানে শৈশব-কৈশোরে। উৎসচ্যুত শিশু-কিশোর পূর্ণবয়স্ক হয় এবং আজীবন নিমগ্ন থাকে অতীত-স্মরণে। জাত-পাত, ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, লাঞ্ছনা, হতাশা পেরিয়ে উজ্জ্বল খুদে চোখগুলো হয় ব্যথাতুর, করুণ। 'বল্মীক' উপন্যাসে নারায়ণ সান্যাল পাঠককে এরকমই এক সমাজসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। শিশু-কিশোর চরিত্র গোরা-বাবলু-লতু হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রকাশিত হয়েছে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনে শিশু-কিশোরের সংকট।

Reference:

১. চৌধুরী, অমিতাভ দেব, নষ্টনীড় : দেশভাগ এবং বাঙালি। দাশ উদয়চাঁদ ও চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম সম্পাদিত, দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বর্ধমান, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট, ২০০৫, পৃ. ৬৭
২. সান্যাল, নারায়ণ, বল্মীক, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ৫০
৪. তদেব, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২১৭
৬. তদেব, পৃ. ২৮
৭. তদেব, পৃ. ১২১
৮. পাল, মধুময়, সম্পাদিত, দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ, কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২০, পৃ. ৮

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

সান্যাল, নারায়ণ, বল্মীক, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০১৯

সহায়ক গ্রন্থ :

ঘোষ, সেমন্তী, সম্পাদিত, দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, কলকাতা, গাঙচিল, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮
দাশ উদয়চাঁদ ও চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম সম্পাদিত, দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বর্ধমান, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট, ২০০৫
পাল, মধুময়, ক্যাম্পবস্তির বালকবেলা, কলকাতা, লা স্ত্রাদা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২৪
পাল, মধুময়, সম্পাদিত, দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ, কলকাতা, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০২০